গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ২০ সংখ্যা | ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ - ৫ জানুয়ারি ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা

জন্মশতবর্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

“বাস্তবে জ্ঞানজগতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করেছে সর্বযুগে শোষিত সম্প্রদায় তাদের বাঁচার তাগিদেই। কারণ যুগে যুগে শোষিতশ্রেণির মুক্তির প্রশ্নটি সমাজের ক্রমবিকাশ ও সমাজবিপ্লবের প্রশ্নটির সাথে জড়িয়ে থাকে বলেই সত্য জানবার সত্যিকারের প্রয়োজন শোষিতশ্রেণির। আর শোষকশ্রেণির সত্যকে চাপা দেওয়াই কাজ।”

—সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে

তাঁরা সকলেই ধনকুবেরদের সেবায় নিবেদিত, জানিয়ে দিলেন অর্থমন্ত্রী

কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজের গেটের বাইরে রাস্তার ধারে শ'তিনেক মানুষের বিশাল লাইন। বিনামূল্যে দুপুরের খাবার বিতরণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার গাড়িটা আসার সময় হয়ে গেছে যে! উল্টোদিকে গলির একটু ভেতরে গেলেই মিলবে পাঁচটাকায় ডিম ভাতের মা ক্যান্টিন। সেখানেও লাইনটা কিছু কম নয়। মনে পড়ে গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাহেবের কথা— ভোটের জন্য বিরোধী দলের সরকারগুলো ‘রেউড়ি’ (খয়রাতি) বিতরণ করে অর্থনীতির অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছে। কিন্তু চোখের সামনে এতগুলো মানুষকে একটু ভাতের জন্য এতক্ষণ লাইন দিতে দেখে ‘রেউড়ি’ শব্দটা ঠিক হজম হচ্ছিল না। এঁরা সবাই কি বিনা প্রয়োজনে শুধু ‘ফ্রি’-এর লোভে দাঁড়িয়ে গেছেন লাইনে? কথা বলে তা একেবারেই মনে হল না। বড় অভাবের জ্বালায় পোড়া পরিবারের একজনের পেটের আগুনটা একবেলার জন্য জুড়ানো গেলেও তাঁরা বাঁচেন। সেই আশাতেই তাঁরা লাইনে। তাহলে কীসে প্রধানমন্ত্রীর আপত্তি? তাঁর সরকারও তো নানা সুবিধা বিতরণ করে, তার বেশিরভাগটা কাদের জন্য যায়? কাদের দিলে অর্থনীতির ক্ষতি হয় না, আর কাদের দিলে ক্ষতি হয়? এই সব ভাবতে ভাবতেই খবরের কাগজে চোখে পড়ল ২১ ডিসেম্বর সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কথাগুলো।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তাঁরা ক্ষমতায় আসার আগে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কাঁধে ছিল বিপুল ঋণের বোঝা। আর ব্যাঙ্কগুলোর ঘাড়ে ছিল বিপুল অনাদায়ী ঋণের পাহাড়। তাঁদের রাজত্বে তা কমে গেছে। কী করে? রিজার্ভ ব্যাঙ্কই জানিয়ে দিয়েছে পদ্ধতিটা। সরকারের নির্দেশে গত পাঁচ বছরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো ১০ লক্ষ ৯ হাজার ৫১১ কোটি টাকা ঋণ স্রেফ মুছে দিয়েছে। পরিভাষায় যাকে বলে ‘রাইট অফ’ করা। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, না, আমরা এটা মকুব করিনি শুধু ব্যাঙ্কের খাতা শুধরে দিয়েছি। তিনি অবশ্য বলেননি, এর সঙ্গে যোগ করে ধরতে হবে, গত মার্চের হিসাব অনুযায়ী ৭ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ যা এখনও ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মোছা হয়নি। এই ঋণ আর কি কোনও দিন আদায় হবে? অর্থমন্ত্রী যতই আদায় করার কথা বলুন তিনি নিজেই সংসদে জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল বলে সময় সাপেক্ষ। বাস্তব হল, গত কয়েক বছরে এই ‘রাইট অফ’ করা ঋণের মাত্র দুই শতাংশের কম উদ্ধার করার প্রক্রিয়া চালু করা গেছে। এই টাকা কাদের ছিল? জনগণের ব্যাঙ্কে জমানো কষ্টের টাকাগুলোই এভাবে কর্পোরেটের ভাঁড়ারে ঢুকেছে এটাই সত্য নয় কি? তাহলে মোদি সরকারও ‘রেউড়ি’ বিতরণ করে। শুধু সাধারণ মানুষকে দেওয়া ছিটেফোঁটা ভর্তুকি কিংবা সুবিধাতেই তাঁদের ঘোর আপত্তি!

২২ ডিসেম্বর সংসদে অর্থমন্ত্রী মেনেছেন, তাঁরা আম্বানি-আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের অবাধ সুবিধা বিতরণ করেন। একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাসত্ব করার যে অভিযোগ তাঁদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সুভাষচন্দ্রের আদর্শবিরোধী’

সাক্ষাৎকারে বললেন নেতাজি কন্যা অনিতা বসু পাফ

জার্মানিতে সাংবাদিকের সঙ্গে অনিতা বসু পাফ

বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ি সম্প্রতি তাঁর জার্মানি সফরের সময়ে স্টাডবুর্গেন শহরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা অনিতা বসু পাফ-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নেন। সেটি নাগরিক ডট নেট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ আমরা এখানে প্রকাশ করলাম।

প্রশ্ন ঃ ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর চলছে। একইসঙ্গে এটা সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মের ১২৫তম বছর। আপনার কি মনে হয় স্বাধীন ভারত তাঁর অবদানকে যথার্থ স্বীকৃতি দিতে পেরেছে?

অনিতা বসু পাফ ঃ আমার বাবা সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারত তাঁর অবদানকে প্রাপ্য মর্যাদা পুরোপুরি দিতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। সুভাষচন্দ্র বসু এবং আইএনএ-র অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি আজও মেলেনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটো ধারা ছিল। একটা ধারা অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী, অন্যটা আপসহীন সংগ্রামে। আমার বাবা ছিলেন দ্বিতীয় ধারার উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি। বহু দশক ধরেই একটা প্রচার চলে আসছে যে, ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কৃতিত্ব অহিংস ধারার। এটা ঠিক নয়। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভূমিকাও বিরাট ছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে

দুয়ের পাতায় দেখুন

আবাস যোজনায় তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নিকৃষ্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান করে এসইউসিআই(সি) দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা প্রস্তুতে তৃণমূলের নেতা, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও তাদের আত্মীয়-পরিজনের নাম যেভাবে জড়িয়ে গেছে তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি ও দলবাজির এর থেকে বড় উদাহরণ খুব বেশি নেই। যাঁদের ছাদওয়ালা পাকা বাড়ি আছে এবং উপভোক্তা তালিকায় যাঁদের নাম কোনওভাবেই থাকার কথা নয়, তাঁদের নামও ঢুকেছে তালিকায়।

দুয়ের পাতায় দেখুন

আবাস যোজনায় স্বজনপোষণ ও সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদে ২২ ডিসেম্বর পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে বিক্ষোভ। (খবর ছয়ের পাতায়)

নেতাজি কন্যার সাক্ষাৎকার

একের পাতার পর

আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক সংগ্রাম চিরকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। লাল কেল্লায় আইএনএ-র বিপ্লবী যোদ্ধাদের বিচার চলাকালীন তাঁদের মুক্তির দাবিতে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। নৌবিদ্রোহের অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিলেন তাঁরা। এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বেশি চর্চা হওয়া প্রয়োজন।

তবে আমি একটা কথা বলতে চাই। ইতিহাসবিদ বা রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকার উপর বাবার স্মৃতি নির্ভরশীল নয়। ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ বাবার স্মৃতি বুকে নিয়ে বাঁচেন। এত বছর পরেও সুভাষচন্দ্র বসু কোটি কোটি মানুষের জীবনের আদর্শ। ওঁর মতো একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর এর চেয়ে বড় কোনও প্রাপ্তি হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ ভারতে নির্বাচন এসে পড়লে বহু রাজনৈতিক দলই সুভাষচন্দ্র বসুর কথা বলে, তাঁর ছবি নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি দিল্লিতে সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আপনি বিষয়টাকে কী ভাবে দেখেন?

অনিতা ঃ আমি সারাক্ষণ ভারতের খবর রাখি। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে বাবাকে নিয়ে মাতামাতি করে, তাঁর ছবি ব্যবহার করে, সবই জানি। আমার এই নিয়ে খুব কিছু বলার নেই। সুভাষচন্দ্র বসুকে তো তাঁর দেশের মানুষ শ্রদ্ধা জানাবেন বটেই। রাজনৈতিক দলগুলোও তো দেশেরই অংশ। তবে এই শ্রদ্ধা প্রদর্শন যেন প্রকৃত শ্রদ্ধা হয়। আমার বাবা কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, ফরওয়ার্ড ব্লক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কংগ্রেস থেকে ভেঙেই তৃণমূল কংগ্রেস হয়েছে। তবে কংগ্রেস যে সবসময় সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দিতে খুব উৎসাহী ছিল, তেমন আমার মনে হয়নি।

দিল্লিতে বাবার মূর্তি উদ্বোধন হওয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি যাইনি। ৮ সেপ্টেম্বর মূর্তির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী, আমি ৩ সেপ্টেম্বর আমন্ত্রণ পত্র পাই। কেন ৮ সেপ্টেম্বর তারিখটাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল তাও বুঝতে পারিনি। ওই তারিখের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর কোনও যোগ নেই।

আর একটা কথা বলতে চাই। সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর আইএনএতে ধর্মীয় ভেদাভেদের কোনও জায়গা ছিল না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে তাঁর মতাদর্শ একেবারেই মেলে না। ধর্মীয় ভেদাভেদের রাজনীতি এবং সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ পরস্পরবিরোধী।

প্রশ্ন ঃ অনেকে অভিযোগ করেন সাম্প্রতিককালে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা আক্রান্ত হচ্ছে। আপনার কী অভিমত?

অনিতা ঃ আমি এই প্রসঙ্গে আমার বাবার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অনুশীলনের কথা বলতে পারি। আগেই বললাম, সুভাষচন্দ্র যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন, তা এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মাচরণ ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু রাষ্ট্রকে হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ। সব নাগরিকের অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। তা যদি কোনও দেশে না হয়, তা হলে বিষয়টা দুঃখজনক। বিভাজনের রাজনীতি আমার বাবার রাজনৈতিক অনুশীলন ও মতাদর্শের পরিপন্থী। উনি যখন ঝুঁকিপূর্ণ সাবমেরিনযাত্রা করলেন, তখন ওঁর সঙ্গী ছিলেন একজন মুসলিম। ওঁর শেষ বিমানযাত্রাতেও সঙ্গী ছিলেন একজন মুসলিম। আইএনএতে কোনও ধর্মীয় সম্ভাষণের জায়গা ছিল না, একটিই সম্ভাষণ 'জয় হিন্দ'। এই কথাগুলো মাথায় রাখা জরুরি।

প্রশ্ন ঃ আপনার মায়ের কথা কিছু বলুন। কী করে ওঁদের আলাপ হল?

অনিতা ঃ আমার মায়ের জন্ম ১৯১০ সালে। ওঁর যখন ২৪ বছর বয়স, তখন ওঁর সঙ্গে বাবার দেখা হয়। ১৯৩৪ সালে বাবা চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় ছিলেন। মান্দালয় এবং বার্মায় জেলে থাকাকালীন উনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সরকার ওঁকে শর্তাধীনে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় আসার অনুমতি দেয়। ভিয়েনায় থাকাকালীন বাবা একটা বই লিখছিলেন, সেই জন্যে একজন সেক্রেটারি খুঁজছিলেন। একজন ভারতীয় ছাত্র আমার মায়ের কথা ওঁকে জানায়, মা সেক্রেটারি হিসাবে কাজে যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই ওঁরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

তিনের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় পুরো সময়টাই বাবা ভারতে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে উনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, ১৯৩৯ সালে মহাত্মা গান্ধী সমর্থিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে আবার সভাপতি হন। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪১ সালে আমার বাবা আবার জার্মানিতে পা রাখেন। এরপর ১৯৪৩ সালে উনি সাবমেরিনে জাপানে চলে যান। আমার জন্ম হয় ১৯৪২ সালে।

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কার্যকলাপ, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা নিয়ে যদি কিছু বলেন।

অনিতা ঃ আমার বাবার প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য ছিল তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভ। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করেন মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। কোণঠাসা ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। সুভাষচন্দ্র আরও মনে করেছিলেন, দেশে থেকে এই কাজ সম্ভব নয়। ধাক্কা দিতে হবে দেশের বাইরে থেকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ লগ্নে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর প্রথম পছন্দের দেশ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। মনে রাখা দরকার উনি জার্মানিতে এসেছিলেন সোভিয়েতের উপর দিয়েই। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ওঁকে সাহায্য করতে পারল না। এই অবস্থায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মানি, জাপান এবং ইটালির সাহায্য নেন। নিঃসন্দেহে এই দেশগুলোর সাহায্য নেওয়া তাঁর পক্ষে 'গ্রেট চয়েস' ছিল না। কিন্তু যদি আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাই, তা হলে দেখব এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য উনি ব্রিটেনের শত্রুপক্ষের সাহায্য চেয়েছিলেন। ওই বিশেষ সময়ে ব্রিটেনের শত্রুদের সাহায্যই ওঁকে নিতে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র যে ফ্যাসিস্ট ছিলেন না, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তখন বাবা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। ওঁর বহু পরিকল্পনা এর ফলে ধাক্কা খায়। জার্মানিতে আইএনএর যে শাখা ছিল, তাদের উপর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, তারা কেবলমাত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বে। এর ফলে তারা কখনওই রাশিয়ায় যুদ্ধ করতে যায়নি। অত্যন্ত জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

প্রশ্ন ঃ আজকের ভারতে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক মতাদর্শ ঠিক কতখানি প্রাসঙ্গিক?

অনিতা ঃ আমার বাবা একজন বামপন্থী ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না ঠিকই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও হননি, কিন্তু মতাদর্শগতভাবে ছিলেন বামপন্থী। বাবা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাস করতেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর দিতেন। চারের দশকে তিনি আইএনএতে মহিলা বাহিনী তৈরি করেছিলেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন (পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেত্রী লক্ষ্মী সায়গল)। বাবা বিশ্বাস করতেন ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ নয়, সব ধর্মের মানুষের সমানাধিকার রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। আমি মনে করি এর সবকটাই এখনকার ভারতের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র জলঙ্গি ইউনিটের প্রবীণ সদস্য কমরেড এহিয়া মণ্ডল ১৫ নভেম্বর ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

১৯৬৪ সালে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সান্নিধ্যে এসে কমরেড মণ্ডল দলের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জলঙ্গিতে কাজ শুরু করেন। তিনি শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত থাকায় নানা সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দলের আদর্শ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন গড়ে তুলতেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

কমরেড এহিয়া মণ্ডল প্রথম পার্টি কংগ্রেসের সময় দলের সদস্যপদ পান। দীর্ঘদিন তিনি জলঙ্গি লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন। যতদিন সুস্থ ছিলেন ততদিন এলাকায় দলের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। একটা সময় শারীরিক সমস্যার কারণে দলের কাজ তেমনভাবে করতে না পারায় নিজেই সদস্য পদ নবীকরণ না করার অনুরোধ জানান। আমৃত্যু তিনি নিজের এলাকায় দলের কর্মীদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

২৭ নভেম্বর হরেকৃষ্ণপুর প্রাইমারি স্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের কর্মী-সমর্থক সহ এলাকার বহু বামপন্থী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কমরেড এহিয়া মণ্ডলের জীবনসংগ্রামের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবাশীষ চক্রবর্তী।

কমরেড এহিয়া মণ্ডল লাল সেলাম

মদের প্রসার রুখতে আন্দোলনে এআইএমএসএস

মদ ও মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিল, নারী ধর্ষণ বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা, নারীর নিরাপত্তা রক্ষা সহ বিভিন্ন দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ও পাঁশকুড়া ব্লকের বিডিও অফিসে এআইএমএসএস-এর পক্ষে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ২৩ ডিসেম্বর পাঁশকুড়া ব্লকের ডেপুটেশনে প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রতিমা অধিকারী, সিক্তা মাজী, নমিতা জানা প্রমুখ। বিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। ২২ ডিসেম্বর কোলাঘাট ব্লকের জয়েন্ট বিডিও স্মারকলিপি নেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অঞ্জলি মান্না, অনিমা হান্ডা, সুতপা সিনহা প্রমুখ।

আন্দোলনের ডাক

একের পাতার পর

অথচ যাঁদের বাস্তবে মাথা গোঁজার উপযুক্ত আস্তানা নেই তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। তৃণমূলের এই নেতাদের যাঁরা যাচাই পর্বে এসে নাম বাদ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদের উত্তর দিতে হবে: সমীক্ষা পর্বে কীভাবে তাঁদের নাম ঢুকল। তখন কাঁচা বাড়ি ছিল, এখন ছাদ হয়েছে এসব যুক্তি যে ছেঁদো তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। আবার এই যাচাই করার কাজে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে কর্মরত আশাকর্মীদের যে ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে তা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ এটা তাঁদের কাজ নয় এবং তাঁদের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে মতামত দেওয়াও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি—১) অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উপযুক্ত তালিকা প্রকাশ করতে হবে, ২) যাঁদের নাম কোনও ভাবেই থাকার কথা নয়, রাজনীতির রঙ না দেখে তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দিতে হবে, ৩) আশা বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নয়, উপযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে এই যাচাই করতে হবে, ৪) অন্যায় ভাবে নাম ঢোকানোর কাজে যুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এই দাবিতে প্রকৃত গৃহহীনদের নিয়ে জেলায় জেলায় বিডিও, এসডিও, জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সংগঠিত করার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

দর্শন বলতে কী বুঝি

(৩)

গণদাবীর গত দু'টি সংখ্যায় দর্শন সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে আমরা সাধারণভাবে দর্শনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেগুলি পর পর সাজালে দাঁড়ায়, প্রথমত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বিশেষ সত্যগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ যোগসূত্রটি খুঁজে বের করে তার ভিতর থেকে জগৎ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে, সেই সামগ্রিক ধারণা, সেই সাধারণ সত্যের উপলব্ধিই হচ্ছে দর্শন।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখার বিশেষ বিশেষ নিয়ম (ল) বা তত্ত্বগুলির (থিওরি) অন্তর্নিহিত সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি থেকে আমরা বস্তুজগৎ সম্পর্কে যে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারি তা হচ্ছে, (১) মানুষের সমস্ত প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যের ধারণাই বস্তু সম্পর্কিত, (২) জগৎ সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে সঠিক সামগ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে হলে মানুষের নিজের মনগড়া ধারণার উপর নির্ভর না করে আমাদের নির্ভর করতে হবে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যের উপর। কারণ মানুষের মনের উপর বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যলব্ধ ধারণার প্রতিফলনই হচ্ছে বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, সত্য জ্ঞান।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে মেনে নেওয়ার পর আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষ সত্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে নিচের সাধারণ সত্যগুলি পেলাম ঃ

প্রথমত, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু, অর্থাৎ জড়, জীব, মানুষ, মানুষের সমাজ, মানুষের মন তথা চিন্তাজগৎ— এ সব কিছুরই আবির্ভাব বস্তু থেকে। এ বস্তু কোনও বিশেষ বস্তু নয়, নির্বিশেষ বস্তু।

দ্বিতীয়ত, কোনও বস্তুই জগতের অপারপর বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সমস্ত বস্তুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, সমস্ত বস্তুই পরিবর্তনশীল, সনাতন বা শাশ্বত বা চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই। এই শব্দগুলি কেবলমাত্র আপেক্ষিক অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে।

চতুর্থত, সমস্ত বিশেষ বস্তুই তার আভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রতিনিয়িত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন কখনও ঘটছে বিলম্বিত লয়ে— যখন সেই বিশেষ বস্তুটির বিশেষ বিশেষ গুণ এবং ধর্ম মোটামুটি বজায় রেখেই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। আবার কখনও ঘটছে অতি দ্রুত লয়ে, যখন সেই পুরাতন বস্তুটি তার পুরাতন গুণ এবং ধর্ম বিসর্জন দিয়ে নতুন গুণ এবং ধর্ম সমন্বিত নতুন কোনও একটি বিশেষ বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। পরিবর্তনের এই রীতি অনুসরণ করেই আমরা জানতে পারছি যে, একটি বিশেষ বস্তুর বিকাশের পথেই সেই বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করতে করতে বস্তু ক্রমাগত বিকশিত হয়ে চলেছে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি বা সাধারণ সত্যগুলি মানব সমাজের সামনে এসেছে মাত্র একশো-দেড়শো বছর আগে। দর্শন বলতে কেবলমাত্র যদি এই সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি থেকে উদ্ভূত জ্ঞানটুকুই বোঝায়, তা হলে ওই একশো-দেড়শো বছরের আগে কি দর্শন বলে কোনও বিষয় ছিল না? যদি না থেকে থাকে তা হলে হঠাৎ একশো-দেড়শো বছর আগেই বা বিশেষ করে এই বিষয়টির জন্ম হলে কোথা থেকে? আর যদি থেকেই থাকে তা হলে সেটা কী?

মানব সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই, যুক্তি-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার শুরু থেকেই 'দর্শন' ছিল— তবে দর্শনের যে সংজ্ঞা বর্তমান আলোচনার শুরুতে আমরা পেয়েছি, সে অর্থে ছিল না। তা হলে কী অর্থে ছিল?

দর্শনকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষ সত্যগুলির সমন্বয়কারী শাস্ত্র না বলে, যদি বলা হয় 'বস্তুজগত ও জীবন সম্পর্কে মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার নির্যাস হচ্ছে 'দর্শন', তা হলে এই সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত কথাই বলা হয়ে যায় এবং বলা বাহুল্য, আমাদের প্রথমোক্ত সংজ্ঞাও এই সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়। এই সংজ্ঞাটিকে সামনে রেখে মানব সমাজের প্রথম পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত পর্বের দর্শন চর্চার ইতিহাসকে পর্যালোচনার সুযোগও আমাদের ঘটে। না হলে বিজ্ঞানের অনগ্রসর সেই যুগের দর্শন চর্চাকে আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করতে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে।

সভ্যতার আদিপর্বে, আদিম, শ্রেণিহীন, গোষ্ঠীগত সাম্যবাদের যুগে, মানুষ যখন সবে প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, তখনকার দিনের মানুষের চিন্তা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বস্তুকেন্দ্রিক। সেদিন বস্তুজগতকে জানবার প্রচেষ্টায়, প্রকৃতিকে বোঝবার প্রচেষ্টায় তার সঞ্চিত সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে আলো, হাওয়া, জল, মাটিকেই চরম সত্য বা অন্তিম বস্তু বলে ধরে নিয়েছে। আজকের ভাববাদী দার্শনিকদের মতো এই দুনিয়াটাকে কেবলমাত্র বাইরের কোনও শক্তির বা কোনও বস্তু নিরপেক্ষ চেতনা বা যুক্তিপদ্ধতির প্রতিফলন হিসেবে দেখেনি। সেদিনকার মানুষের সমস্ত জ্ঞান সমস্ত অভিজ্ঞতাই ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে। তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় আদিম বন্য বর্বর গোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তির প্রতি মনোভাব থেকে। আগুন, পাথর, বজ্র, বিদ্যুৎ, বন্যা, ঝড়-জল—এই সব প্রাকৃতিক শক্তি বা ঘটনাগুলিকে মানুষ সন্তুষ্ট রাখতে চাইত তাদের দ্বারা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বা তাদের কাছ থেকে উপকার পাওয়ার জন্য। নীল নদকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মিশরবাসীদের নদীতে কন্যা বিসর্জন কেবলমাত্র মিশর দেশেরই ঘটনা নয়, দুনিয়ার সমস্ত দেশেই অল্পবিস্তর এ ধরনের নজির পাওয়া যায়।

কিন্তু এই বস্তুকেন্দ্রিক, বস্তুনির্ভর, বস্তুসর্বস্ব চিন্তা অব্যাহত গতিতে বিকাশ লাভের সুযোগ পায়নি। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানব সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বস্তুবাদী চিন্তা বা জ্ঞানের পাশাপাশি আর একটা চিন্তাধারা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছে— যে চিন্তাধারায় বস্তুকে আর দুনিয়ার সমস্ত কিছুর উৎস বলে স্বীকার করা হল না। বরং এই জগতটাই যে বাইরের কোনও শক্তি দ্বারা পরিচালিত বা সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ কোনও স্বয়ম্ভু চেতনার প্রতিফলন— সেই কথাটাই জোর করে ঘোষণা করা হল। কিন্তু চিন্তাধারার এই দ্বিধাবিভক্তি এল কী করে?

সভ্যতার আদিপর্বে আজকের মতো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার এত বিকাশ ঘটেনি। বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান তখন অত্যন্ত সীমিত ছিল। আবার এই সীমিত জ্ঞানটুকুও সমাজের সমস্ত মানুষের অধিকারে সমানভাবে ছিল না। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের স্বল্পতা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার অনগ্রসরতা সমাজে যে শ্রেণিবিভেদ এনে দিয়েছিল, তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শোষক শ্রেণি এবং শোষিত শ্রেণির শ্রেণিগত স্বার্থচিন্তা— মানুষের চিন্তাক্ষেত্রে পাশাপাশি এই দুটি বিপরীতধর্মী চিন্তাধারার জন্ম হল। স্বাভাবিকভাবেই শোষক শ্রেণির চিন্তাধারায় শোষণ-শাসনের সুযোগ-সুবিধাকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য এবং শোষিত শ্রেণির চিন্তাধারায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দুটি পরস্পরবিরোধী দার্শনিক মতেরও জন্ম হল। যেহেতু তখনকার সীমিত জ্ঞানের চর্চাও সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত সমাজের সুবোধাভোগী এবং অভিজাত গোষ্ঠীরই মধ্যে, সেই জন্য লিখিত দর্শনের আনুপূর্বিক ইতিহাসেও তাদেরই শ্রেণিগত স্বার্থচিন্তার প্রতিফলনটাই বেশি। লিখিত দর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তাই দেখা যায়— দর্শনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কখনও বলা হয়েছে— দর্শন ধর্মের খাস নফর মাত্র। কখনও দর্শনকে জীবনযাত্রা প্রণালীর পথ নির্দেশক বলে দেখিয়ে, জীবনযাত্রাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে চলতি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো টিকিয়ে রাখার উপযুক্ত নিয়মকানুনের বাঁধা রাস্তায়। বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার ফলে বস্তুজগতের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত ধারণা, প্রধানত সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞান চর্চার সীমাবদ্ধতা, মুনি-ঋষি, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম যাজক সম্প্রদায়ের জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে আধিপত্য এবং দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবজগতের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের সম্পর্কশূন্যতা ইত্যাদি নানা ঘটনা একসঙ্গে ঘটার ফলে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানচর্চা বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন নিছক যুক্তিতর্ক এবং অলীক কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার ফলে আজকের মতো সামগ্রিকভাবে দুনিয়াকে জানার উপায় সেদিন ছিল না। অথচ দুনিয়াকে জানবার আকাঙ্ক্ষাটা ছিল পুরো মাত্রায়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত নিয়মশৃঙ্খলার হদিশ বাতলানোর উপায় বিজ্ঞানের ছিল না। তাই প্রচলিত শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সমাজের সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা বিধানের অধিকারী স্বৈরাচারী শাসকের একাধিপত্যই মানুষের মনে প্রতিফলিত হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা বিধানের অধিকারী এক অপার্থিব শক্তির একাধিপত্যের ধারণার মধ্যে।

এইভাবে একদিকে দুনিয়াকে জানবার আকাঙ্ক্ষা এবং অন্য দিকে জানবার প্রকৃত উপায় বিজ্ঞানের অনগ্রসরতা— এই দুয়ে মিলে দর্শনকে ঠেলে নিয়ে গেল প্রচলিত শাসন-শোষণ ব্যবস্থার স্বার্থে ব্যবহারের জন্যে ধর্মের তল্পি বওয়ার কাজে। অর্থাৎ নিছক যুক্তি-বিজ্ঞানের চর্চা তার আপন গতিতে বিকাশ লাভ করার পথে বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল এবং দার্শনিকেরা সমসাময়িক সমাজের মধ্যে তাঁদের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী জগৎ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে এক একজন এক এক রকম মতামত দিতে লাগলেন। তাঁদের কাছে বাস্তব ঘটনা বিচার বিশ্লেষণের চাইতে বড় হয়ে দাঁড়ালো তাদের নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে মানবজাতির কর্তব্য-কর্ম নির্ধারণ করা, সামাজিক ভাল-মন্দের মাত্রা নির্ধারণ করা। আর তাই করতে গিয়ে এই দর্শন স্বাভাবিকভাবেই সুবিধাভোগী শ্রেণির স্বার্থে ব্যবহৃত হল সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, অন্ধতা, ভয়-ভীতি এবং আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। অসহায় সাধারণ মানুষের দঃখ দুর্দশা দারিদ্র অভাবের সামনে এই বস্তুজগতকে মায়া বলে বুঝিয়ে এই জগতের বাইরে সত্যিকার জগৎ— স্বর্গরাজ্যের ছবি এঁকে তুলে ধরা হল। মর মানুষকে অমরত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্টি হল এই বস্তুজগতের বাইরে ভগবানের এক আলাদা রাজ্যের। এ জন্মের দুঃখ-কষ্টকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য অত্যাচার শোষণকে মেনে নেওয়ার জন্য গড়ে উঠল কর্মফলবাদ, গড়ে উঠল পুনর্জন্মবাদ। এ জন্মে যারা দুঃখভোগ করবে মৃত্যুর পরে তাদের সিট রিজার্ভ করে রাখা হল অক্ষয় স্বর্গে। আর এ জন্মে যারা সমস্ত সুখ-সম্পদ-ঐশ্বর্য ভোগ করবে তাদের জন্য মৃত্যুর পর বরাদ্দ করা হল নরকে বাসস্থান।

অবশ্য সমস্ত দর্শনেই স্বর্গ-নরকের ধর্মীয় ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া হয় না। কিন্তু চার্বাক বা প্লেটো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু দার্শনিকই স্বর্গ-নরক না মেনেও মোটামুটি একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন। এই ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করার মাধ্যমে 'ভাববাদী' দর্শনই এক এক জনের হাতে এক এক রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

(চলবে)

(এই নিবন্ধটি ১৯৬২ সালে গণদাবী ১৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা থেকে ৯ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পুনঃপ্রকাশ করা হল। এ বার তৃতীয় অংশ)

যেহেতু তখনকার সীমিত জ্ঞানের চর্চাও সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত সমাজের সুবোধাভোগী এবং অভিজাত গোষ্ঠীরই মধ্যে, সেই জন্য লিখিত দর্শনের আনুপূর্বিক ইতিহাসেও তাদেরই শ্রেণিগত স্বার্থচিন্তার প্রতিফলনটাই বেশি। লিখিত দর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তাই দেখা যায়— দর্শনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কখনও বলা হয়েছে— দর্শন ধর্মের খাস নফর মাত্র। কখনও দর্শনকে জীবনযাত্রা প্রণালীর পথ নির্দেশক বলে দেখিয়ে, জীবনযাত্রাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে চলতি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো টিকিয়ে রাখার উপযুক্ত নিয়মকানুনের বাঁধা রাস্তায়।

পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবি বিপিটিএ-র রাজ্য সম্মেলনে

১৭-১৯ ডিসেম্বর কোচবিহারের হলদিবাড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২৮তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন থেকে প্রতিটি ক্লাসের জন্য শিক্ষক নিয়োগের দাবি উঠল। এ ছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল, দ্রুত টেটের ফলাফল প্রকাশ, স্বচ্ছভাবে নিয়োগ ইত্যাদি ২০ দফা দাবি তোলা হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিন প্রকাশ্য সমাবেশ হয় জেসিআই মাঠে। আলোচনা করেন অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের সম্পাদক অধ্যাপক মানস জানা, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি বাসুদেব বিশ্বাস, সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মোসাব্বর হোসেন। সম্মেলন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রাথমিক শিক্ষার অবশেষটুকুকেও ধ্বংস করবে' বিষয়ক সেমিনারে আলোচনা করেন সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সহ সম্পাদক বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ মৃদুল দাস। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আনন্দ হান্ডা এবং সভাপতি হিসেবে মোসাব্বর হোসেন পুনর্নির্বাচিত হন।

আবাস যোজনার কাজ থেকে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের রেহাইয়ের দাবি

আবাস যোজনা প্লাস-এর সার্ভের কাজে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের যোগ দেওয়ার সরকারি নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন ও ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে বলা হয়েছিল, এই কাজ করতে গেলে এঁরা নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তাছাড়া রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়ার পাশাপাশি নানা লাঞ্ছনার শিকারও হবেন তাঁরা।

তা সত্ত্বেও ব্লক প্রশাসন জেলায় জেলায় এই কাজ করতে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বাধ্য করছে। ফলে কর্মীরা নানা সমস্যার মধ্যে পড়ছেন। চাপ সহ্য করতে না পেরে ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার এক কর্মী আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ। ১০ দিন কাজ করার কথা বলে ২০ দিন পার হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁদের দিয়ে এই কাজ করানো চলছে।

এই পরিস্থিতিতে এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের চিফ সেক্রেটারির কাছে ২৩ ডিসেম্বর ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে সার্ভের কাজ থেকে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অব্যাহতি দাবি করা হয়। মৃত কর্মীদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য ও একজনের চাকরির ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়েছে।

পুরুলিয়ায় কমসোমলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৮ ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলা কমসোমলের উদ্যোগে ফুসড়াবাইদ হাসপাতাল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪টি ইভেন্টে প্রায় দুশোর বেশি প্রতিযোগী অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বক্তব্য রাখেন কমসোমলের রাজ্য স্তরের সংগঠক কমরেড বাপি হালদার। উপস্থিত ছিলেন জেলা ইনচার্জ কমরেড উমেশ রায় এবং এআইডিএসও-র জেলা সভাপতি কমরেড স্বপন পরামাণিক। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সেখানে আবৃত্তি এবং গান পরিবেশন করেন কমসোমল সদস্যরা।

জেলায় জেলায় রোকেয়া স্মরণ

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির আহ্বানে ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া স্মরণ অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০টি কলেজে পালিত হয়। এই দিনটি তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস। পুরুলিয়ার জে কে কলেজ (ছবি), নিস্তারিনী কলেজ, রঘুনাথপুর কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর কলেজ ও গোপ কলেজ, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর গার্লস কলেজ, কে এন কলেজ সহ অন্যান্য কলেজে স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০ টি স্থানে রোকেয়া স্মরণ অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির সভা

নারী নির্যাতন ও সমস্ত ধরনের অন্যায় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে ১৮ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলায় রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর রোকেয়া ভবনে। তালাক, বহুবিবাহ সহ সার্বিক নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং পিছিয়ে পড়া অসহায় নারীর সন্তানদের ফ্রি কোচিং, বাল্যবিবাহে মাঝপথে পড়া বন্ধ হওয়া নারীদের নিয়ে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, বিনা ব্যয়ে সেলাই ট্রেনিং, বিনা ব্যয়ে আইনি পরিষেবা, দুঃস্থ নারীদের শীতে কম্বল ও গরমে শাড়ি বিতরণ, নিয়মিত ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে নারীদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সহ বহুবিধ কাজ সমিতি করে চলেছে। সভা থেকে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা কাবেরী বিশ্বাস ও সম্পাদক নির্বাচিত হন খাদিজা বানু। দ্বিতীয় অধিবেশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া মানুষদের সম্মানিত করা হয়।

বেলমুড়িতে গাছ কাটার প্রতিবাদ এলাকার বাসিন্দাদের

কিছুদিন আগে বেলমুড়ি রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের রাস্তার দু'ধারে রেলওয়ে এক্সটেনশন প্রোজেক্টের অজুহাতে ঠিকাদার সংস্থা হঠাৎ বেশ কিছু গাছ কেটে ফেলে। গত তিন বছর ধরে এই এলাকায় 'দ্য গ্লোবাল গ্রিনফোর্স' নামে একটি পরিবেশ সংগঠন রাস্তার দু'ধার এবং রেল সীমানা বরাবর দেবদারু, বট, অশ্বত্থ, অর্জুন, পাকুড়, আম, জাম, মেহগনি, আমলকি, তেঁতুল, শিশু সহ বিভিন্ন গাছ রোপণ করে বড় করে তুলছে। অথচ ঠিকাদার সংস্থাটি এইসব গাছ নিজেদের তৈরি দেখিয়ে বিল করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। এবার তারা গ্রিনফোর্স-এর উদ্যোগে লাগানো কিছু গাছের সাথে বহু পুরনো গাছও বিনা কারণে নষ্ট করে দিয়েছে।

কারখানা দূষণে জর্জরিত বেলমুড়ি এলাকায় শতবর্ষ প্রাচীন কিছু হেরিটেজ গাছ রয়েছে। আছে বহু বড় গাছ। কিন্তু ঠিকাদার সংস্থা জানিয়েছে, এই গাছগুলিকেও কেটে ফেলা হবে। গ্রিনফোর্সের সম্পাদক লেনিন বসুর নেতৃত্বে এলাকার মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, ব্যাপক পরিবেশ দূষণের এই যুগে যখন যন্ত্রের সাহায্যে গাছ স্থানান্তর পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত, তখন এ ভাবে গাছ ধ্বংস করা গর্হিত অপরাধ ছাড়া কিছু নয়। এই অন্যায় রুখতে গ্রিনফোর্সের স্থানীয় সদস্যরা সক্রিয় হন এবং হাওড়া জিএম-এর কাছে সংস্থার বিভিন্ন শাখা থেকে মেইল করে গাছ রক্ষার আবেদন জানানো হয়। রেলওয়ে মন্ত্রকের টুইটার হ্যান্ডেলেও টুইট করা হয়। চন্দননগর পরিবেশ অ্যাকাডেমি থেকে রেল দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছে আবেদন জানানো হয়। জানানো হয় বনদপ্তরকেও। ২৩ ডিসেম্বর হাওড়া ডিআরএম অফিসে গ্রিনফোর্সের পোলবা-দাদপুর, ধনিয়াখালি শাখার সভাপতি অর্ক মালিক, বৈদ্যবাটি শাখার আহ্বায়ক হেমন্ত বেলেল, উত্তরপাড়া-ডানকুনি শাখার সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন সহসম্পাদক কাকলি দত্তবসুকে নিয়ে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল হেরিটেজ গাছগুলির সংরক্ষণ সহ গ্রিনফোর্স রোপিত গাছগুলির সুরক্ষা অথবা স্থানান্তরের দাবিতে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন। কপি পাঠানো হয়েছে হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনের প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনকেও। দাবি আদায় না হলে এলাকার মানুষকে নিয়ে গাছগুলির সুরক্ষার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২৭ সালে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেন রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ি ও রোশন সিং। ১৯ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে টি ডি কলেজে এআইডিএসও-র উদ্যোগে তাঁদের স্মরণদিবস পালন

মদের দোকান বন্ধের দাবি আবগারি দপ্তর ও থানা ডেপুটেশন

তিন বছর আগে বন্ধ হওয়া মদের দোকান পুনরায় খোলার প্রতিবাদে ২৩ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আবগারি দপ্তর ও ১৮ ডিসেম্বর তমলুক থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তমলুক পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের রত্নালি এলাকায় চার বছর আগে দুটি মদের দোকান চালু হলে এলাকার বাসিন্দারা মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি গড়ে তুলে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। ফলে দুটি দোকানই বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আবার একটি দোকান নভেম্বর মাসে চালু হলে এলাকার বাসিন্দারা তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রতিদিন বিক্ষোভ-মিছিল-পিকেটিং চলে। মদ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে গণস্বাক্ষর সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক, আবগারি দপ্তর, পুলিশ সুপার, পৌরসভায় প্রতিবাদপত্র দেওয়া হয়।

এই দোকান বন্ধের দাবি জানিয়ে কয়েকদিন আগে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রশাসনিক স্তরে চিঠি দিয়েছেন। কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় কর বলেন, রত্নালী এলাকার মানুষজন শান্তিতে বসবাস করেন। কিন্তু মদের দোকান হলে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। মহিলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা থাকবে না। প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে এই মদের দোকান বন্ধ করা হোক।

বেলদায় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন বেলদা শাখার উদ্যোগে শ্যাম গেস্ট হাউসে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ২৪ ডিসেম্বর। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, পিএমপিএআই-র রাজ্য সভাপতি তথা জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, চিকিৎসক যোগেন্দ্র নাথ বেরা, প্রদীপ দাস, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের জেলা নেতৃত্ব মানস কর ও দিলীপ মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারগুলির স্বাস্থ্যনীতি দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার সার্বিক বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কার্যত কর্পোরেট মালিকদের লুটের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে। সুপার স্পেশালিটির নামে সরকারি টাকায় ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং হলেও প্রথাগত হাসপাতাল সহ এই সকল হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ছে। ওষুধ ছাঁটাই করা হচ্ছে। ডাক্তার নিয়োগ হচ্ছে না। প্যাথলজিক্যাল টেস্ট প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে করতে হচ্ছে। ওষুধও বাইরে কিনতে হচ্ছে। হাসপাতালগুলোর ভূমিকা বাস্তবে বেসরকারি সংস্থার এজেন্টের মতো। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার অধিকার রক্ষার লড়াই তীব্রতর করতে হবে। কোনও টালবাহানা না করে অবিলম্বে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চালু করে চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ সাধারণ মানুষের আয়ত্তে রাখতে হবে।

বেলদা জোনের বিভিন্ন এলাকার গ্রামীণ চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য রক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, শিক্ষক, অধ্যাপক সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন অতিমারি কোভিড কালে বেলদায় অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণকারী করোনা হেল্প ডেস্ক-এর স্বেচ্ছাসেবকরা।

শিশুপাঠ্য বইতেও বিকৃত ইতিহাস

উদ্বিগ্ন শিক্ষক-শিক্ষাবিদরা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে একটি সিবিএসই স্কুলে ছাত্রদের পড়তে দেওয়া শিশুশ্রেণির সাধারণ জ্ঞানের কুইজ একটি বইতে অদ্ভুত প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হয়েছেন শিক্ষকরা। প্রশ্নোত্তরটি হল—

প্রশ্ন ঃ সিন্ধু সভ্যতার প্রথম দেবতার নাম কী?

উত্তর ঃ শিব।

সঙ্গে শিবের একটি আধুনিক মূর্তির ছবি, মাথায় যথারীতি সেই চাঁদের ফালি ও জটা; কিন্তু রঙিন নয়, একটি স্লেটরঙা পাথরের মূর্তির আবক্ষ অংশ। প্রথমে বিষয়টিকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও তাঁরা পরে উপলব্ধি করেছেন — এই তথাকথিত হাস্যকর প্রশ্নোত্তর ও তার সঙ্গী ছবিটির মধ্যে লুকিয়ে আছে শিশু মস্তিষ্কে কতগুলি বিকৃত ও অসত্য ধারণাকে স্রেফ তথ্য মুখস্থ করানোর ছলে গেঁথে দেওয়ার এক মারাত্মক প্রয়াস। সত্যটা বুঝে হাসির বদলে আশঙ্কাই বড় হয়ে উঠেছে তাঁদের।

বাস্তবিক ‘ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম’ নামক বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতির সাম্প্রতিক আক্রমণ যে আসলে আমাদের সমাজজীবনে জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাভাবনার স্তরে কী ধরনের ভয়ঙ্কর হুমকি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, সামাজিক স্তরে তার উপাদান ইতিমধ্যেই কী পরিমাণে এবং কতটা মজুত হয়ে রয়েছে, তার একটা আন্দাজ এর মধ্যে দিয়ে পেয়ে শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন। যাক, সে এক পৃথক আলোচনা। আপাতত, সিন্ধু সভ্যতায় দেবতা হিসেবে শিবের আদৌ কোনও স্থান ছিল কি না, এবং থাকলেও তা কতটা, তা একটু দেখে নেওয়া যাক।

প্রথমে একটু খতিয়ে দেখা যাক, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে যা পাওয়া যায়— যেমন কোনও ধ্বংসস্তূপ, সিলমোহর, শিলালেখ, কোনও চিঠি বা এইরকম বাস্তব কিছু— তার সাথে ‘ইতিহাসের’ সম্পর্ক আসলে কী? অবশ্যই এগুলিকে ভিত্তি করেই ইতিহাস রচিত হয়, কিন্তু তার প্রক্রিয়াটি ঠিক কী? ইতিহাসবিদরা তাঁদের ধারণার উপর ভিত্তি করে এই উপাদানগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন, সেই সময়ের প্রাপ্ত অন্য উপাদানের সাথে তাদের সম্পর্ক নিরূপণ করে সেই সময়ের মানুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই কাজের ধরনের কারণেই ‘পাথুরে প্রমাণ’ হিসেবে তখন সামনে যা থাকে, তার ব্যাখ্যায় মিশে যায় যে ইতিহাসবিদ তাকে ব্যাখ্যা করছেন তাঁর নিজস্ব সময়, চিন্তাভাবনা ও ধারণা। এগুলি কিন্তু সবটাই তাঁর নিজস্ব এবং সাবজেকটিভ। আর ঠিক এখানেই ইতিহাস ঐতিহাসিক উপাদানের অবজেকটিভিটি থেকে সরে যায়, হয়ে পড়ে কল্পনাশ্রয়ী। সেই কারণেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস রচনার জন্য সবসময় চেষ্টা করা দরকার, ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য থেকে ঠিক যেটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারা যায়, ইতিহাসবিদের ব্যাখ্যাকে ঠিক ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। না হলেই কল্পনার বল্গা হরিণ ছুটতে আরম্ভ করে গুলিয়ে দেবে গোটা বিষয়টিকেই।

সিন্ধু সভ্যতায় সিলমোহরে যে মূর্তির রিলিফ পাওয়া গেছে, তার সাথে পরবর্তী দেবতা ‘শিব’-এর ধারণার কতটা সত্যি মিল আছে? সিলমোহরে মূর্তিটিকে ঘিরে বিভিন্ন পশুকে দেখা যায়। সিন্ধু সভ্যতার ভাষার পাঠোদ্ধার আজও হয়নি। তাই তাকে সে যুগের মানুষ তাকে সত্যিই যে নামে ডাকত তা না জানার ফলে পশুপতি বলা হয়। এই নামটি কিন্তু পুরোপুরি আধুনিক কয়েনেজ। আবার পরবর্তী আর্য যুগের (বৈদিক নয়, তার পরবর্তীকালে) দেবতা শিবেরও আরেক নাম, তথা ধারণা পশুপতি। এই শিবের প্রাথমিক ধারণাও আর্যরা অনার্যদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিল বলে ধারণা করা হয়। যদিও সেই অনার্যদের সাথে সিন্ধুসভ্যতার কতটুকু যোগসূত্র ছিল তা আমাদের অজানা এবং সেই কারণেই বিষয়টা অনিশ্চিত। এই সব মিলিয়ে অনেকের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে ওঠে এবং আধুনিক হিন্দু ধর্মোদ্ভূত ভাবনা ও পরিবেশের কল্যাণে সার জল পেয়ে তা রীতিমতো ছড়িয়েও পড়তে শুরু করে যে, শিব হল সিন্ধু সভ্যতার সময়ের দেবতা। আমাদের বোঝা দরকার - এই ধারণাটি একটি আধুনিক ফ্যালাসি বা বিভ্রান্তি মাত্র। আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাস নির্মিত হয় পাথুরে প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু সেই প্রমাণকে যখন কেউ ব্যাখ্যা করেন, ঐতিহাসিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার তাগিদেই যে ব্যাখ্যার দরকারও আছে, কিন্তু সেই সময়েই আবার ঘনিয়ে আসতে পারে অন্য বিপদ। ইতিহাসের এবং বিজ্ঞানের নির্মোহ দৃষ্টিতে তা পরিচালিত না হলে ওই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাকারের নিজস্ব ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ফলে বাস্তবে তা হয়ে দাঁড়ায় অনেকটাই মনগড়া। ইতিহাসের প্রকৃত চিত্রের বদলে প্রচলিত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয় তা। ফলত প্রকৃত প্রমাণভিত্তিক ইতিহাস থেকে তা অনেকটাই দূরের বিষয়। ‘সিন্ধু সভ্যতার দেবতা ছিল শিব’- এই ধারণাটি এই কারণেই প্রমাণ্য ইতিহাসের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন। আর ‘প্রথম’-এর তো কথাই ওঠে না, কারণ সিন্ধু সভ্যতার দেবতাদের দুনিয়া বা প্যানথিওন এবং তার গঠন সম্পর্কে আমরা এখনও পর্যন্ত প্রায় কিছুই জানি না।

ছয়ের পাতায় দেখুন

আবাস যোজনায় দুর্নীতি রঘুনাথপুরে মিছিল

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় লাগামহীন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও দলবাজির বিরুদ্ধে এবং প্রকৃত প্রাপকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি সহ নানা দাবিতে ২২ ডিসেম্বর রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের কাছে এসইউসিআই(সি) পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শতাধিক মানুষের মিছিল বরাকর রোড থেকে এসডিও দপ্তর পর্যন্ত যায়। (ছবি একের পাতায়)।

এসডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। এই মহকুমার অর্ন্তগত বিভিন্ন গ্রামের বঞ্চিত ৩৮০ জনের তালিকা প্রতিনিধি দল পেশ করে, নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা। একই দাবিতে জেলার ঝালদাতে পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

আবাস যোজনার দুর্নীতির প্রতিবাদে ঝালদায় পঞ্চায়েত ডেপুটেশন

শিশুপাঠ্য বইতেও বিকৃত ইতিহাস

পাঁচের পাতার পর

সিলমোহরটি ১৯২০ সালে আবিষ্কৃত হয়। এএসআই-এর তৎকালীন ডিরেক্টর জন মার্শাল প্রাথমিকভাবে একে শিব বা রুদ্র বলে অভিহিত করেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাসবিদরা প্রায় সকলেই এই ধারণার বিরোধিতা করে বলেছেন, এটি একটি আধুনিক প্রচলিত ধারণাকে জোর করে ইতিহাসের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস মাত্র।

ইতিহাসবিদ ডরিস শ্রীনিবাসনের মতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের এই সিলমোহরের শিবের মতো তিনটি মুখমণ্ডল নেই, তার ভঙ্গির সাথেও যোগরত শিবের ভঙ্গির পার্থক্য আছে। তা ছাড়া বৈদিক দেবতা রুদ্রের ধারণার সাথে পশুপতির ধারণা সংশ্লিষ্টই নয়। ইতিহাসবিদ আলফ হিলটেবাইটেল পাথুরে প্রমাণের উপর কোনওরকম অতিরিক্ত ধারণাকেই চাপিয়ে দিতে অস্বীকার করে মূর্তিটিকে শুধুমাত্র মহিষদেবতা বলে অভিহিত করেছেন যা সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতিতে মহিষের সম্ভব্য গুরুত্বের ইঙ্গিতবাহী।

আবার ইতিহাসবিদ গ্রেগরি পোশেল মূর্তিটিকে একটি দেবতা বলে স্বীকার করলেও, কিছুটা জলহস্তীর অনুকরণে তা গঠিত এবং তার ভঙ্গি কোনও চালু ধর্মীয় আচারের অনুবর্তী বলে মনে করেন। আর একটি সিলমোহরে ওই মূর্তিটির পাশে কোনও পশু নেই। ফলে পশুপতির ধারণাও এখানে দুর্বল। কিন্তু শিবের এমনকি কোনও আদি ধারণার সাথেও তাকে মেলাতে গেলে কল্পনাকে অনেক দূর পর্যন্ত স্বাধীনতা দিতে হয় বলেই মনে করেন তিনি। আবার কেউ কেউ, যেমন হাইনরিখ সিমার মূর্তিটির সাথে প্রথম জৈন তীর্থংকর ঋষভনাথেরও সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। মোটমাট বোঝাই যাচ্ছে, জন মার্শালের প্রাথমিক অনুমানটি আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত নয়।

তা হলে এইরকম একটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ধারণাকে সাধারণ জ্ঞানের নামে যুক্তিবুদ্ধির স্তর গড়ে ওঠার আগেই শিশুমনের উপর চাপিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? নাকি তার পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য বিদ্যমান? উত্তরটাও জানা, বিজেপি সরকার তাদের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এইরকম বিকৃতিই ঘটাতে চাইছে। সব মিলিয়ে ইতিহাস, বিজ্ঞান আজ বিপন্ন। যে শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছেন তাঁদের পাশে আজ সকলকে দাঁড়াতে হবে।

ধনকুবেরদের সেবায় সকলেই নিবেদিত ঃ অর্থমন্ত্রী

একের পাতার পর

বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষ করেন, তার একটাও তিনি অস্বীকার করেননি। একচেটিয়া মালিকদের জন্য কর্পোরেট কোম্পানি কর ক্রমাগত কমিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের ঘাড়ে পরোক্ষ করের বোঝা চাপানোর জন্য তিনি গর্বই প্রকাশ করেছেন। বিজেপি সরকার কর্পোরেট কোম্পানির আয়ের উপর কর ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২ শতাংশ ও নতুন কোম্পানির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ করেছে। এর ফলে সরকারের ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা কম আয় হচ্ছে। এই ঘাটতি সরকার মেটাতে তারা জিএসটি এবং অন্যান্য সেস ও শুল্ক বসিয়ে পরোক্ষ করের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। যা দিতে হয়— একেবারে দরিদ্রতম মানুষটি থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষকে। খরচ কমাতে শ্রমিক-কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রে সরকার নিজের দায় কমিয়েছে, স্থায়ী কর্মীর বদলে কম পয়সায় চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে কাজ করাচ্ছে। রেলে বয়স্ক নাগরিকদের কনসেশনও বন্ধ, ঘুরপথে রেলের ভাড়া বেড়েছে। জনকল্যাণের সমস্ত ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিয়েছে, গ্রামীণ মানুষের রোজগার যোজনাতেও কাটছাঁট। ২০২৪-এর লোকসভা ভোট পর্যন্ত আপাতত বিনামূল্যে রেশন চালু রাখার কথা বললেও তাতে বরাদ্দ বিশেষ বাড়ায়নি। বিশ্ববাজারে অশোধিত পেট্রোলিয়ামের দাম যতই কমুক দেশে তেল-গ্যাসের দাম এতটুকু না কমিয়ে তা থেকে চড়া হারে শুল্ক আদায় করছে। গরিবের জ্বালানি কেরোসিনে পর্যন্ত ভর্তুকি পুরোপুরি বন্ধ।

অর্থমন্ত্রীর একটাই দুঃখ, এসবের জন্য সংসদে বসে থাকা বিরোধীরা বিজেপিকে একাই দোষ দেয় কেন? এ ব্যাপারে কংগ্রেসই যে পথপ্রদর্শক। কংগ্রেস আমলে ১৯৯৪-এ কর্পোরেট আয়ের উপর কর ছিল ৪৫ শতাংশ, তা কমতে কমতে ২০০৫-এ দাঁড়ায় ৩০ শতাংশ। সেই পথেই কর্পোরেট মালিকদের কষ্ট কমাতে তিনিও পিছিয়ে থাকতে চাননি।

জনস্বার্থ বলি দিয়ে আদানি, আম্বানি, টাটাদের মতো একচেটিয়া মালিকদের বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কাজে বিজেপি অবশ্যই এগিয়ে। নানা রাজ্যের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উঠতে অর্থমন্ত্রী তাঁদের এমন কাজগুলির কথা অস্বীকার করেননি। শুধু বলেছেন, আমরাই কি একা করি? তিনি কেরালায় আম্বানিদের হাতে ভিজিনজাম বন্দর তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, কংগ্রেসই ভিজিনজাম বন্দরকে থালায় সাজিয়ে আম্বানিদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছে। সিপিএম আমলেও তা বদলায়নি। স্মরণ করা যেতে পারে, এই বন্দরের কারণে পরিবেশ ধ্বংস, তা আদানিদের হাতে দেওয়া ও মৎস্যজীবীদের গায়ের জোরে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মৎস্যজীবীদের আন্দোলন দমন করতে সে রাজ্যের সরকারি দল সিপিএম এবং কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপি হাতে হাত মিলিয়ে মাঠে নেমেছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, রাজস্থানে কংগ্রেস সরকার একই কায়দায় আদানিদের জমি দিচ্ছে। শুনতে শুনতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে পড়বেই সম্প্রতি প্রস্তাবিত তাজপুর বন্দরের মালিকানা আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়ে তাদের কর্তাদের সামনে তৃণমূল নেতাদের হাত কচলানোর কথা। পিপিপি মডেলের মধ্য দিয়ে স্কুলশিক্ষাকে ধীরে ধীরে কর্পোরেট পুঁজির ছায়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তৃণমূল সরকারের পরিকল্পনার কথাও মনে পড়বে। মনে পড়তে বাধ্য, কর্পোরেট স্বার্থবাহী কেন্দ্রীয় তিন কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলার সময়েই ২০২১-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ২০২২-এর ১ জানুয়ারি গণশক্তি ও দ্য হিন্দু কাগজে প্রবন্ধ লিখে সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কর্পোরেট কোম্পানিগুলির সাথে বসে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে। আরও মনে পড়বে হঠাৎ করে বিজেপি জোট ছেড়ে আরজেডি, কংগ্রেস সহ সিপিএম-এর শরিক হওয়া নীতীশ কুমারের সরকার বিহারে আদানিদের, আম্বানিদের অত্যাধুনিক কৃষিপণ্য ব্যবসার পরিকাঠামো করতে অনেক আগেই ছাড়পত্র দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও তৃণমূল সরকার আম্বানিদের আদানিদের কৃষিপণ্য নিয়ে বৃহৎ ব্যবসার ছাড়পত্র দিচ্ছে। মনে রাখা ভাল, পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও খাদ্যের পাইকারি ব্যবসার নামে কর্পোরেট পুঁজিকে ঢোকার ছাড়পত্র প্রথম দিয়েছিল সিপিএম সরকার। বিজেপি, কংগ্রেস, আপ কিংবা সিপিএম ইত্যাদিরা, যে যেখানে ক্ষমতায় গেছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের পথে হেঁটেছে। আপ সরকার দিল্লিতে বিদ্যুতে টাটা-আম্বানিদের কোম্পানিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কেন্দ্রীয় নীতির বিপক্ষে বললেও কার্যক্ষেত্রে কোম্পানিগুলির অন্যায্য মুনাফার বিরুদ্ধে কোনও ভূমিকা নেয়নি। অথচ ভোটবাজারে জনপ্রিয় হওয়ার তাড়নায় সরকারি কোষাগার থেকে ভর্তুকি দিয়ে বিদ্যুতের দাম কম রাখছে। ফলে নাগরিকদের করের টাকা ঘুরপথে সেবায় লাগছে কর্পোরেট কোম্পানিরই। এতে মালিকরা খুশি, কর্পোরেটের পয়সায় ভোট তহবিলও ভরে ওঠে, ভোটেও সুবিধা হয়। ফলে অর্থমন্ত্রী মিথ্যে অভিযোগ করেননি।

অর্থমন্ত্রী খুশি তাঁদের সরকারের সাথে কংগ্রেসের কাজের অদ্ভুত মিলের জন্য। পেট্রোপণ্যের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা, ভর্তুকি বন্ধের কাজটা কংগ্রেসই শুরু করেছিল। তারা যাদের নির্দেশে চলেছে, বিজেপি ঠিক তাদের নির্দেশেই চলছে। পার্থক্য শুধু মাত্রায়। বিজেপি সরকার রাফাল যুদ্ধ বিমানের বরাত সরকারি কেম্পানি হ্যালের বদলে অনিল আম্বানিদের কোম্পানিকে পাইয়ে দিলে ভোটের আগে ‘সুট-বুটকা সরকার’ বলে কংগ্রেস খুব স্লোগান দেয়। কিন্তু দেশের মানুষের মনে তা দাগ কাটে না। কারণ মানুষ জানে খনি, ব্যাঙ্ক, বিমা, ইস্পাত, তেল, বিমান, টেলি সংযোগ ক্ষেত্র থেকে শুরু করে একেবারে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র পর্যন্ত সবকিছু বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়ার হোতা কংগ্রেসই। তারাই আর্থিক সংস্কারের নামে একচেটিয়া মালিকদের হাতে দেশের মানুষের সমস্ত সম্পদ তুলে দিতে শুরু করেছিল। তারাই চাকরির ক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়োগ কমানো, আউট সোর্সিংয়ের হোতা। তাদের রাজত্বকালটা কয়েক বছর আগে বলে জনগণের উপর তখন আক্রমণের গতিটা বিজেপির এখনকার তুলনায় একটু কম ছিল। বিজেপি এই গতি মারাত্মক হারে বাড়িয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে বিষময় ফল জনজীবনের উপর বর্তাচ্ছে তাতে কে বড় শোষক, কে কম, তার পার্থক্য খোঁজা মুশকিল।

শাসকদলগুলির এই একচেটিয়া মালিক-সেবা আসলে তাদের চরিত্রের মধ্যেই গাঁথা হয়ে আছে। তারা পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হিসাবেই রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ। জনগণের ভোট পেতে কখনও কখনও অসহনীয় শোষণের বিরুদ্ধে তাদের কিছু কথা বলতে হয়। যে দল সরকারে আছে তার বিরুদ্ধে গলা ফাটাতে গেলে বিরোধী আসন থেকে একচেটিয়া মালিকদের নামেও দুচারটে গালিও দিতে হয়। কিন্তু একচেটিয়া মালিকরা ভালই জানে এতে তাদের কোনও ভয় নেই। বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় বসা কিংবা ভোটের বিরোধী হিসাবে ভেসে থাকা নানা রঙের দলগুলি আসলে চরিত্রগতভাবে যে পুঁজিপতিশ্রেণির সেবক তা চিনতে মালিকদের ভুল হয় না। সংবাদমাধ্যমও কখনও কখনও জনগণের ওপর চলা শোষণের স্টিমরোলারটার বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভের বারুদ জমতে দেখে পুঁজিপতি শ্রেণিকে হুঁশিয়ারি দেয়। তারা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ‘স্যাঙাৎতন্ত্রে’র অভিযোগ তোলে। যেন বিশেষ বিশেষ একচেটিয়া গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বাড়ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটার কোনও দোষ নেই! আসলে যে সত্যটা তারা চাপা দিতে চায়— এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনে কে জিতবে, সরকার কে গড়বে, মন্ত্রী কে হবে এটা পুঁজিপতি শ্রেণিই ঠিক করে দেয়। একইভাবে কখন কোন বিরোধী দলকে সরকারের বিরুদ্ধে পপুলার করে তুলে জনসাধারণের ক্ষোভকে একটু প্রশমিত করতে হবে, তার জন্য কাকে প্রচারের আলোয় আনতে হবে তাও ঠিক করে তারাই। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থবাহী নানা দলের তরজাকেই দেশের মানুষের সামনে একমাত্র রাজনৈতিক বক্তব্য হিসাবে উপস্থিত করার ব্যবস্থা মালিকরাই করে দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বরূপ চেনানোর মতো কোনও দল থাকলে তাদের বক্তব্যগুলো সামনে না আসতে দেওয়ার জন্য তারা তৎপর।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বিরোধীদের উপর রেগে গিয়ে একটা সত্য বলে ফেলেছেন— মালিকের সেবাদাসত্বে বিজেপি, কংগ্রেস, আপ এমনকি বামপন্থী সিপিএম থেকে শুরু করে নানা সময় ক্ষমতার ভাগ পাওয়া দলগুলোর কেউই কম যায় না। মালিকদের সেবক হওয়ার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে, এই নিয়ে সংসদে তরজা চলে। আর মানুষকে বোঝায় এটাই গণতান্ত্রিক ‘ভোট যুদ্ধ’।

সিনেমার গুণাগুণ বিচারও করে দেবে শাসকরা?

গোয়ায় অনুষ্ঠিত, ভারতের ৫৩তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান নাদাভ লাপিড ঠিক কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'কাশ্মীর ফাইলস' ছবিটি তাঁদের 'জুরি সদস্যদের' মনে হয়েছে কদর্য, প্রচারমূলক এবং এ রকম একটি মর্যাদাপূর্ণ উৎসবের শৈল্পিক প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়ার পক্ষে বেমানান। তিনি এ-ও বলেছিলেন, এই মঞ্চে খোলাখুলি নিজের অনুভূতি তিনি নির্দ্বিধায় প্রকাশ করছেন, কারণ তাঁর ধারণা, এ রকম একটি চলচ্চিত্র উৎসব সমালোচনাকেও খোলামনে গ্রহণ করতে পারে, শিল্পে এবং জীবনে সমালোচনা জিনিসটা অত্যাবশ্যক। নাদাভ লাপিডের মন্তব্য, উৎসবের আয়োজক এবং ছবি নির্বাচক সংস্থা ভারত সরকারের তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ভাল লাগার কথা নয়। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ হিসাবে যাঁদের উৎসবে ডাকাই হয়েছে ছবির গুণাগুণ বিচার করে মত দেওয়ার জন্য তাঁরা নির্দ্বিধায় সেই মত দেবেন এটাই স্বাভাবিক। এটাই জুরিদের কাজ। লাপিড সেটাই করেছেন। কিন্তু খোলামেলা সমালোচনা গ্রহণ বিজেপি রাজত্বে যে একেবারে নিষেধ, সেটা লাপিডের জানা ছিল না।

বাস্তবে কী ঘটল? ওই ছবির পরিচালক, এক মুখ্য অভিনেতা সহ বিজেপি শিবিরের লোকজন লাপিডের মন্তব্য নিয়ে খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ফোনে, মেলবক্সে, সোশাল মিডিয়ায় বিদ্বেষপূর্ণ মেসেজ এবং ব্যক্তি-আক্রমণের ফোয়ারা ছুটল। অর্থাৎ, একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার, যিনি 'গণতান্ত্রিক' ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি এবং বিচারক হয়ে অন্য দেশ থেকে এসেছেন, তিনি বুঝে গেলেন এই ভারতে খোলামনে মত প্রকাশ বিপজ্জনক। এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহলেও বার্তা গেল, এ দেশে শাসকের মতই শেষ কথা। শিল্পবোদ্ধা সমালোচকেদের কর্তব্য হল সরকারের তালে তাল দেওয়া।

নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে আরএসএস-বিজেপি শিবিরের মাথারাও ভালোমতোই জানেন, যতই তারা ইতিহাস খুঁড়ে সত্য বের করার কথা বা কাশ্মিরী পণ্ডিতদের সুবিচার দেওয়ার কথা বলুন, বাস্তবে 'দ্য কাশ্মীর ফাইল' ছবিটি নির্মাণের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্য। এ ছবি ইতিহাসকে তুলে ধরেনি, ইতিহাস এবং ঘটনাকে বিকৃত করেছে। কাশ্মীর উপত্যকার দীর্ঘ বছরের সমন্বয়ী সংস্কৃতি 'কাশ্মীরিয়ৎ'কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। কাশ্মীরে উগ্রপন্থীদের আক্রমণে অসংখ্য মুসলমান নাগরিকের মৃত্যুর উল্লেখমাত্র করেনি। মিলিটারির বুটের তলায় পিষ্ট কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে আড়াল করেছে। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতদের ঘটনার পিছনে তৎকালীন সরকারের ভূমিকা এবং অপদার্থতা এড়িয়ে গিয়ে এই ছবি শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক হিংসা উস্কে দিতে চেয়েছে, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে মুসলমান মাত্রই বর্বর এবং সন্ত্রাসবাদী, পণ্ডিত বিতাড়নের জন্য সন্ত্রাসবাদীরা নয়, কাশ্মীরের মুসলমান ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষও দায়ী।

বিবেক অগ্নিহোত্রীর কাশ্মীর ফাইলস যে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের তুরুপের তাস করে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠতে চেয়েছে এবং শিল্পগুণবিবর্জিত মোটা দাগের এই ছবিটি স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক উৎসবের মঞ্চে তুলে আনা হয়েছে, এ কথা বুঝতে লাপিড সহ বিচক্ষণ চলচ্চিত্রকারদের অসুবিধা হয়নি। সমালোচনার উত্তরে লাপিড নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে বলেছেন, 'আমাদের সকলেরই ছবিটি দেখে মনে হয়েছে, সেখানে ধারাবাহিক ভাবে ঘটনা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, অশ্লীল এবং হিংসাত্মক বিষয় অপ্রাসঙ্গিক ভাবে টেনে আনা হয়েছে। হিংসার বীজ বপন করার উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হয়েছে বলে মনে হয়েছে আমাদের সকলের।" জুরি বোর্ডের আরও তিন সদস্য এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। লাপিড এ-ও বলেছেন, ছবিটির মধ্যে তিনি সরকারের কাশ্মীর নীতির প্রতি সমর্থন এবং ফ্যাসিবাদের চরিত্রলক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। জুরিদের এই মত স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা মানেননি। বিরোধিতা করতে তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ চেনা ছকে মাঠে নেমেছেন। কেউ বলেছেন, লাপিড পণ্ডিতদের ইতিহাস না জেনেই সমালোচনা করছেন, কেউ পরোক্ষে লাপিডকে বিশ্বাসঘাতক বলে বসেছেন। যত বলেছেন, তত প্রকট হয়েছে বিজেপির অন্দরের মিথ্যাচার এবং স্ববিরোধিতা। যেমন, জম্মু-কাশ্মীরের বিজেপি মুখপাত্র রবীন্দ্র রায়না বলেছেন, লাপিডের উচিত উদ্বাস্তু পণ্ডিতদের ক্যাম্পগুলো ঘুরে তাঁদের দুর্দশা দেখে আসা। অর্থাৎ তাঁর কথা অনুযায়ী, কাশ্মীরী পণ্ডিতরা এখনও উদ্বাস্তু শিবিরে প্রবল কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঘটনার তিন দশক পরেও এখনও পণ্ডিতদের ক্যাম্পে দিন কাটাতে হচ্ছে কেন? বিগত সরকারগুলোর মতো পণ্ডিতদের ঘটনাকে ভোট বাক্সের পুঁজি করা ছাড়া 'হিন্দুত্বের মসিহা' বিজেপি সরকার তাঁদের প্রতি কী দায়িত্ব পালন করেছে? যে তৎপরতায় কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীর ফাইলস-এর প্রচার-বিজ্ঞাপন করেছে, বিগত আট বছরের বিজেপি জমানায় পণ্ডিতদের উপত্যকায় ফেরাবার ব্যাপারে সরকারের সেই তৎপরতার একাংশও দেখা গেল না কেন?

বাস্তব হল ১৯৯০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত কাশ্মীরে ৮৯ জন হিন্দু পণ্ডিত খুন হয়েছিলেন। আর অ-হিন্দু খুন হয়েছেন ১৭২৪ জন। ৩৭০ ধারা রদের পর নতুন করে ১৯ জন পণ্ডিত খুন হয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীদের হুমকির সামনে ৫৬টি পণ্ডিত পরিবারকে অন্যত্র যেতে হয়েছে। অর্থাৎ পণ্ডিতদের জন্য চোখের জল ফেলে প্রচার নিতে সরকার এবং বিজেপি যতটা তৎপর, তাঁদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এদের মাথাব্যথা ততটাই কম।

সংখ্যাতত্ত্ব দেখাচ্ছে, সন্ত্রাসবাদের শিকার অহিন্দুরাও। যাদের হত্যার দায় সরকার এড়াতে পারে না। এই সত্য ঢাকতেই লাপিডকে আক্রমণ করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে বিজেপি।

লাপিড কাশ্মীরেরপণ্ডিতদের ঘটনাকে কোনও ভাবে অস্বীকার করেননি, তাদের দুঃখকেও ছোট করেননি। বস্তুত, ভারতের রাজনীতির সাথে, বিজেপির ভোটে জেতা বা না জেতার সাথে লাপিডের কোনও দেওয়া-নেওয়া নেই। তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য কাশ্মীর ফাইলস ছবি। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ইতিহাসের বিয়োগান্তক ঘটনা নিয়ে 'সিরিয়াস' ছবি হওয়া উচিত— এরকম স্থূল ঘৃণার বেসাতি নয়। লাপিড যা বলেছেন, ভারতে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পরে বহু মানুষ, চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞও সেগুলো বলেছিলেন। শিল্পী যদি ইতিহাসের ট্র্যাজেডিকে শিল্পে তুলে আনেন, তবে মানুষ বস্তুনিষ্ঠ পথেই শিল্পে সেই ট্র্যাজেডির কারণ খুঁজবে, মানুষে মানুষে বিদ্বেষের বিষ সরিয়ে সুস্থ সুন্দরকে দেখতে চাইবে। যে ছবি দেখে দর্শক একটি বিশেষ ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক স্লোগান দিতে থাকে, সেটা আর যা-ই হোক, শিল্প নয়।

কাশ্মীরের পণ্ডিতদের সুবিচার দেওয়া বলতে যারা মুসলমান বিদ্বেষের ঢেউ তোলা বোঝেন, তারা স্বভাবতই বোঝেননি যে, ইহুদিবিদ্বেষের বিরোধিতা করা, ইহুদিনিধন যজ্ঞের নিন্দা করা মানেই ইহুদিবাদী ইজরায়েলি রাষ্ট্রকে সমর্থন করা নয়। সে জন্যই, লাপিডকে ইহুদি নিধন হলোকাস্টের সমর্থক বলে বিজেপি দাগিয়ে দিতে চেয়েছে।

ছবির গুণাগুণের তোয়াক্কা না করে সরকারের আশীর্বাদধন্য ছবিটি অনায়াসে ইফির মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছে গেয়েছিল, কিন্তু সেখানেই বিপত্তি ঘটল। আমন্ত্রণ করে আনা এই ইজরায়েলি পরিচালক, যিনি স্বীয় শিল্পক্ষেত্রেও নিজের দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রের সমালোচনা করে থাকেন, কাশ্মীর ফাইলকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। লক্ষণীয়, ভারতের ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত নায়োর গিলন, লাপিডের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, লাপিডের উচিত লজ্জিত হওয়া, অন্য দেশের মাটিতে অতিথি হয়ে গিয়ে তাঁর এই মন্তব্য ভারতে বসবাসকারী ইজরায়েলিদের অস্বস্তির কারণ হবে।

লাপিডের মন্তব্যের দায় কেন এবং কী ভাবে ইজরায়েলের মানুষের ওপর বর্তাবে, একটি ছবি সম্পর্কে নিজের মতামত জানাতে জুরি হিসাবে একজন চলচ্চিত্রকার কেন লজ্জিত হবেন, এর মধ্যে রাষ্ট্রদূত কেন হস্তক্ষেপ করবেন বা একটি ছবির বিশ্লেষণ কেন আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে, এ-সব প্রশ্নের কোনও উত্তর নাওর গিলোন বা নরেন্দ্র মোদিদের কাছে নেই। কারণ বাস্তবে দুই দেশের সাধারণ মানুষ নয়, অস্বস্তিতে পড়েছেন এবং পড়বেন দুই দেশের সরকার, মালিক পক্ষ। আজকের পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় দুটো দেশের সম্পর্ক মানে দুই দেশের সরকার এবং তার রক্ষক মালিক শ্রেণির ব্যবসার সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের শ্রমে গড়ে ওঠা সম্পদের পাহাড় লুটে কে কত মুনাফা করতে পারে তার প্রতিযোগিতা। তাই সেই সম্পর্কের কেন্দ্রে থাকে এক শতাংশ পুঁজিমালিকের স্বার্থ, নিরানব্বই শতাংশ জনগণের স্বার্থরক্ষা বা উন্নতি নয়। রাষ্ট্রপ্রধানরা মুখে যতই গণতন্ত্রের জয়গান করুন বা গণতন্ত্রের মন্দিরে মাথা ঠুকুন, বাস্তবে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করার ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার বা জিয়নবাদী সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েল উভয়েই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সরকারি উৎসবে আমন্ত্রিত চলচ্চিত্রকার যতক্ষণ সরকারের সমর্থক, ততক্ষণই তিনি 'স্বাধীন'। অন্যথায় তাঁর ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের পরিসরে রাষ্ট্রীয় নজরদারি তো চালানোই যায়, ব্যক্তিগত আক্রমণ করা, একঘরে করে দেওয়াও 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে অসমীচীন নয়।

দক্ষিণ বারাশত
গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ, ন্যায্য প্রাপকদের গৃহের দাবি, জবকার্ডধারীদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া ও আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দক্ষিণ বারাশত লোকাল কমিটির উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর মিছিল করে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পদ্মেরহাট থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করে পঞ্চায়েতে যাওয়া হয়। প্রধান ডেপুটেশন নেওয়া হবে না জানালে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে রাস্তা অবরোধ হয়। লোকাল কমিটির সম্পাদক দিব্যেন্দু মুখার্জি, সদস্য আকবর মিস্ত্রী, স্থানীয় সংগঠক লয়েড এবং দলের পঞ্চায়েত সদস্যা আসমিরা মোল্লা পঞ্চায়েত অফিসে আবাস যোজনার তালিকার বিষয়ে জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তালিকা টাঙিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এর পর মিছিল দক্ষিণ বারাশত বাজারে ইউথ কর্নার মোড়ে আসে এবং পথসভা হয়। মিছিলে মহিলাদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। বক্তব্য রাখেন দলের ডায়মন্ডহারবার জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিজন হাজরা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন আসামে

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধি, জনবিরোধী বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল-২০২২, বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারিকরণ ও প্রিপেইড স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে ১৭ ডিসেম্বর গুয়াহাটির লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদনে অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের ৯টি জেলা থেকে দুই শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক এতে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী অজিত আচার্য। কনভেনশনের প্রধান বক্তা অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সভাপতি রমেশ পরাশর বলেন, পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলো বিদ্যুৎকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা থেকে লাভজনক পণ্যে পরিণত করতে চাইছে। তার জন্য সরকার বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল-২০২২ পাশ করাতে উঠেপড়ে লেগেছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্র কর্পোরেট গোষ্ঠীর করায়ত্ত হলে গরিব সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি জনবিরোধী এই সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ বিভাগের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার সমাজকর্মী বিমল দাস বলেন, নব্বই-এর দশকে বিশ্বায়ন, উদারিকরণ, বেসরকারিকরণের নীতি আমদানির সাথে সাথে সরকার অন্যান্য পরিষেবার মতো বিদ্যুৎকেও ব্যবসায়িক উচ্চ মুনাফার পণ্য হিসেবে তুলে ধরে। এরপর থেকেই বিদ্যুতের মাশুল বেড়ে চলেছে।

বিদ্যুৎ-শ্রমিক আন্দোলনের নেতা দীপক কুমার সাহা বলেন, এই বিলের মাধ্যমে কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ তালিকায় থাকা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকার কায়েমের চেষ্টা চলছে। ফলে রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব হবে এবং সাধারণ গ্রাহকরা নানা ধরনের হয়রানির শিকার হবেন। শুরুতে কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক অজয় আচার্য এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন হিল্লোল ভট্টাচার্য। শেষে জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন, কমিটি গঠন, স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ইত্যাদি একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

দিল্লিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

চিকিৎসক ও চিকিৎসা-কর্মী সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, দিল্লি রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর ধোবি ঘাটে আয়োজিত হয়েছিল একটি চিকিৎসা শিবির। এলাকাটিতে দরিদ্র মানুষের বাস। তাঁদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে এই শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন ডাঃ পি সি ত্যাগী, ডাঃ ভরত দাস, ডাঃ অনির্বাণ ভৌমিক, ডাঃ শ্রীজীব, ডাঃ সাদ্দাম, ডাঃ পীযূষ সহ দিল্লির বেশ কিছু ডাক্তারি ছাত্রছাত্রী।

চিকিৎসার পর প্রায় দুশো রোগীর হাতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তুলে দেওয়া হয়। ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিসের ছবিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শিবির শুরু হয়। ডাঃ ত্যাগী ও ডাঃ দাস এই মহান চিকিৎসকের জীবনসংগ্রামের নানা দিক এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। শিবিরটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন ছাত্রছাত্রী। এলাকার সাধারণ মানুষও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে
ত্রিপুরার আগরতলায় ২২ ডিসেম্বর উদ্ধৃতি ও ছবি প্রদর্শনী

শিলিগুড়িতে ছাত্রীর নৃশংস খুন

জেলা জুড়ে তীব্র বিক্ষোভ

এ রাজ্যে মহিলাদের, এমনকি নাবালিকাদেরও নিরাপত্তা বলতে যে কিছু নেই, তা আবারও প্রকাশ্যে এল শিলিগুড়ির নৃশংস ঘটনায়।

৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির অমিয় পালচৌধুরী স্মৃতি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়। নাবালিকার মা থানায় অপহরণের অভিযোগ জানালেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। এর ৯ দিন পর ১৩ ডিসেম্বর সুকনা ফরেস্টের কাছে স্কুল ড্রেস পরা ওই ছাত্রীর পচা-গলা বিকৃত দেহ পাওয়া যায়। এই নৃশংস ঘটনায় স্থানীয় মানুষ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১৫ ডিসেম্বর স্কুলের পক্ষ থেকে প্রধাননগর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। ওই দিন দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এসইউসিআই(সি) লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে কোর্ট মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তারপরেও পুলিশের পক্ষ থেকে গড়িমসি চলতে থাকে। এরপর মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, পুলিশ সক্রিয় হলে ওই নাবালিকাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারত।

ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশি টহল এবং এমন ঘৃণ্য অপরাধ যাতে আর না ঘটে সেই দাবিতে স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ এলাকার জনসাধারণ সাহুডাঙ্গিতে শেষকৃত্যের সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোকানপাট বন্ধ রাখেন।

ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও সুশ্রুতনগরে বিক্ষোভ মিছিল করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়ে এবং সমস্ত মহিলার নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে ২০ ডিসেম্বর নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ শিলিগুড়ির মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেয়। জেলা জুড়ে এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন।

মণিপুরে ছাত্রমৃত্যু

গভীর শোক প্রকাশ এআইডিএসও-র

২১ ডিসেম্বর মণিপুরে পথ দুর্ঘটনায় ২৬ জন স্কুলছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ। তিনি এক প্রেস বার্তায় বলেন,

২০ ডিসেম্বর ননে জেলার লংসাই তুবুং গ্রামের কাছে বিষ্ণুপুর খুপুমে পূর্ব ইম্ফল জেলার ইয়ারিপোক থাম্বালনু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা দুর্ঘটনায় কবলে পড়েন। এখনও পর্যন্ত ২৬ জন ছাত্রের মৃত্যু এবং ১৪ জনের গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার খবর পাওয়া গেছে। এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সরকার ও শিক্ষাবিভাগকে সতর্ক থাকার দাবি জানান তিনি।

তিনি বলেন, সারা দেশের মতোই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য সড়ক ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এবং ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তিহানি হতে থাকবে। তাই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা অন্য কোনও প্রয়োজনে কোথাও নিয়ে যেতে হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সড়ক পরিস্থিতি মাথায় রেখে সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আমরা মৃত ছাত্রদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। মৃতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের দ্রুত সরকারি দায়িত্বে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com